প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর দেশের সংস্কৃতিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। রায়ে জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রায়ের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তবে এই সমর্থন ও সন্তোষ প্রকাশের ক্ষেত্রে অতিরেক আবেগ-উচ্ছ্বাস কিংবা উচ্ছৃংখলা কোথাও দেখা যায়নি। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর স্বজন ও আত্মীয়-পরিজন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ সংগঠনসমূহ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবীদার। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এ ব্যাপারে উচ্ছ্বাস-উল্লাস প্রকাশ না করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজনরা ছিলেন সতর্ক। দলের তরফেও সংযম প্রদর্শনের তাকিদ দেয়া হয়েছিল। ফলে আবেগ ও সন্তোষ প্রকাশের ব্যাপারটি কোথাও সীমা অতিক্রম করে যায়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দলের নির্বাচনী ইশতেহারে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে দেয়া বক্তব্যে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। শুরু থেকেই তিনি এই অঙ্গীকার পালনে দৃঢ় রয়েছেন। নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর তিনি তার দলীয় নেতা-কর্মীদের আনন্দ মিছিল বের করতে নিষেধ করেছিলেন। ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার এ নির্দেশ ও আহ্বান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়কে কেন্দ্র করেও মূলত তার অভিপ্রায় ও নির্দেশই কার্যকর হয়েছে। চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পর পরই প্রধানমন্ত্রী আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেছেন। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। তার সরকারী বাসভবনে এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে তার ধর্মীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী পরিবারের রেওয়াজ-রসুম সম্পর্কে যারা অবগত আছেন তারা জানেন, এই পরিবারে বিভিন্ন উপলক্ষে শোকরানা নামাজ আদায় ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী সেই পারিবারিক রেওয়াজই অনুসরণ করেছেন। তার ইচ্ছা ও নির্দেশনা অনুযায়ী দল ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর তরফেও সারা দেশে দোয়া ও মিলাদ-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে অসংখ্য মানুষ সমবেত হয়ে তার জন্য দোয়া করেছেন। দেশের বিভিন্ন মসজিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোয়া-মিলাদ হয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়েও এমনি দোয়া হয়েছে। গতকাল জুম্মার নামাজে দোয়া-দরুদ হয়েছে ব্যাপকভাবে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সারা দেশে ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুসরণ যেভাবে লক্ষ্য করা গেছে, তাতে ধর্মীয় সংস্কৃতির চর্চা এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। এজন্য সকল কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারই প্রাপ্য।

শেখ হাসিনা ক্যারিজমা সম্পন্ন এমন এক লিডার যার দলীয় নেতা-কর্মীসহ জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে। নির্বাচনে বিশাল বিজয় থেকে শুরু করে গত প্রায় এক বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ধরনের লিডারই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিসহ জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে অভূতপূর্ব ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারেন। শেখ হাসিনা তার প্রজ্ঞা-মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা দিয়ে 'পলিটিশিয়ান' থেকে 'স্টেটসম্যানে' পরিণত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণার পর তিনি যে ধৈর্য্য, সংযম, দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন এবং গোটা দেশের মানুষকে তার সঙ্গে রেখেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। তিনি শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে সকল প্রশ্নসাপেক্ষ আচরণ ও আশংকা বিদূরিত করেছেন। রায়ের দিনটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে। এটা একটা বিরল নজির। তিনি যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা হুবহু অনুসরিত হয়েছে। শুধু দল ও জনগণই নয়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তার নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করেছে। তিনি চেয়েছিলেন কোনো কারণেই যেন উচ্ছৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। সর্বত্র যেন শান্তি ও নিরাপত্তা অটুট থাকে। তার আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি নেতা হিসেবে আরও উচ্চতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ বিশ্বাস এখন সহজেই করা সম্ভব, জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতির যে মিশন নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন, তাতে তার সাফল্য অবধারিত।

শেখ হাসিনা শান্তির পক্ষে। অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও হানাহানির বিপক্ষে। শান্তি ছাড়া সমৃদ্ধি অসম্ভব। তা দেশেরই হোক কিংবা বিশ্বেরই হোক। তিনি দেশে নিরংকুশ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। একই সাথে বিশ্বের শান্তি-নিরাপত্তাও তিনি একান্তভাবে প্রত্যাশা করেন এবং এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে তার যোগ্য-দক্ষ ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। কোন উপলক্ষে ভীতি-শংকা ও অনিরাপত্তা যাতে দেশের জনগণকে স্পর্শ করতে না পারে, সেদিকে তার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায়ের দিনে আশঙ্কা সত্ত্বেও অশান্তিকর ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কোনো ঘটনা না ঘটা থেকেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। দেশ যখন তার এই ক্যারিজমেটিক নেতৃত্বের প্রশংসায় মুখর, ঠিক তখনই তাকে কেন্দ্র করে একটি সুসংবাদ এসেছে। তিনি ভারত থেকে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধী স্মৃতি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে নিরস্ত্রীকরণ তথা শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এই পুরস্কার লাভের জন্য আমরা তাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। পুরস্কার হলো অবদানের স্বীকৃতি। যখন কেউ এ ধরনের আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান, তখন তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও বেড়ে যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর বলেছিলেন, তার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেলো। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা আশা করবো, সৃজনশীল পরিবর্তনের ধারায় উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার যে ব্রত নিয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলা, খাদ্য নিরাপত্তাসহ শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে যে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন, এসব ক্ষেত্রে তার অভিনিবেশ আরও বাড়বে, বাড়বে দায়িত্বশীলতা। তিনি এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন, সফল হবেন, এই আশা আমরা করতে পারি।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস

আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ঊনিশ শ' একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিগর্ভ সময়ে এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সম্মিলনে যে অজেয় মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল, তারই গর্বিত উত্তরাধিকার লাভ করেছে স্বাধীন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী। একাত্তরের ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনার আগে, নভেম্বরের ২১তারিখে যুদ্ধরত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়ে জাতির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার গৌরব দিয়ে যে বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল, স্বাধীনতার পর থেকে সেই সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে যেমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি ও নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী স্বদেশে যেমন ঐক্য ও জাতীয় সংহতির প্রতীক, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

একটি নতুন ও ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে এবারের সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত হচ্ছে। দুই বছরের জরুরী শাসন পেরিয়ে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতির বিশাল প্রত্যাশা, ডিজিটাল ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার এক সুকঠিন রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনা করছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং জাতীয় নিরাপত্তার নতুন চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে আজ সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমদ সিদ্দিকীর কণ্ঠে সেই প্রত্যাশার কথাই ধ্বনিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'জাতীয় নিরাপত্তা এবং বেসামরিক-সামরিক সম্পর্ক' শীর্ষক এক কর্মশালায় তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক ও বেসামরিক শক্তির মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরীর প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই দুই শক্তির ঐক্যবদ্ধতার কারণেই আমাদের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়েছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামরিক ও বেসামরিক গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টির তাগিদ এখন আমাদের জন্য একটি জাতীয় বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের তিন মাসের মধ্যেই সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআরের অভ্যন্তরে নারকীয় এক ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে। এতদিন আমাদের সশস্ত্র বাহিনী শুধুমাত্র ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত থাকলেও এখন মিয়ানমার সীমান্তও বিশেষ নজরদারিতে যুক্ত হয়েছে। সেই সাথে বঙ্গোপসাগর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামেও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার নতুন তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। অধিক জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ বাংলাদেশের জন্য পার্বত্য জেলাগুলো অপার সম্ভাবনাময় সম্পদে ভরপুর। পার্বত্য জেলাগুলোর পার্শ্ববর্তী জাতীয় সীমান্ত অরক্ষিত রেখে দেশের স্বার্থ রক্ষা করা অসম্ভব। সেখানকার সীমান্ত ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি আমাদের পার্বত্য জনগোষ্ঠীর চিরায়ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সেখানে অবস্থিত বাঙ্গালীদের স্বাতন্ত্র্য ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্যও সশস্ত্র বাহিনীকে নতুন করে সমৃদ্ধ করতে হবে। পার্বত্য এলাকায় বিদেশী ‘এনজিও’ কার্যক্রম এবং খৃস্টধর্মে ধর্মান্তকরণের ব্যাপকতা যেমন উদ্বেগজনক তেমনি সীমান্তের ওপারেও একই পরিস্থিতি এই অঞ্চলে একটি খৃস্টানবলয় স্পষ্ট করে তুলছে। বঙ্গোপসাগরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সম্পদ রক্ষাও এখন এক বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সম্পদ রক্ষায় আমাদের নৌবাহিনীকে আরো আধুনিক ও শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই। গত বছর নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন ও সফল করার পাশাপাশি সমুদ্র সীমায় অপ্রত্যাশিত দখলদারিত্বের অপচেষ্টার ঘটনায় সশস্ত্র বাহিনী জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সফল হয়েছিল। দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আরো শক্তিশালী ও উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে। সেনাসদরে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের আজকের প্রীতি সম্মিলন এবং অনুষ্ঠানমালায় দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তি, তথা বেসামরিক-সামরিক শক্তির ঐক্য সৌহার্দ্যের নতুন প্রত্যয় ও সেতুবন্ধন রচিত হোক, নিশ্চিত হোক জাতীয় নিরাপত্তা ও সুশাসন, এই প্রত্যাশা সকলের।

সমুদ্রসীমার দাবী প্রতিষ্ঠায় আবশ্যিক কাজগুলো দ্রুত শেষ করতে হবে

মুনশী আবদুল মাননান

সমুদ্রসীমা বিষয়ক দুটি টাটকা খবরের একটি হলো, মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরে মহীসোপান নিয়ে যে দাবী জাতিসংঘে উপস্থাপন করেছিল, তা স্থগিত করা হয়েছে। জাতিসংঘের কমিশন অন দ্য লিমিটস অফ দ্য কন্টিনেন্টাল সেলফ (সিএলসিএস)-এ গত বছর ১৬ ডিসেম্বর মিয়ানমার মহীসোপানের নির্দিষ্ট অংশ উল্লেখ করে তার দাবী পেশ করে। বাংলাদেশ গত ২৩ জুন ওই দাবীর বিরুদ্ধে তার আপত্তি জমা দেয়। অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ও সমুদ্রসীমা বিষয়ে দায়িত্ব পালনকারী কমডোর (অব.) খুরশিদ আলম পত্রিকান্তরে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ তার আপত্তিতে বলেছে : মিয়ানমার বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের যে অংশ দাবী করেছে তা বাংলাদেশ থেকে বয়ে আসা পলি (সেডিমেন্টারী রক) দ্বারা গঠিত। জাতিসংঘের সমুদ্র আইনের ৭৬ ধারা অনুযায়ী, মহীসোপানের প্রাকৃতিক বিস্তৃতি (নেচারাল প্রলংগেশন) শুধু বাংলাদেশই যথার্থভাবে প্রমাণ করতে পারে। কারণ মিয়ানমার থেকে কোনো পলি বঙ্গোপসাগরে আসে না।

মিয়ানমারের দাবী ও বাংলাদেশের এই আপত্তির প্রেক্ষিতে সিএলসিএস গত ২৪ আগস্ট তার ২৪তম সভায় মিয়ানমারের বক্তব্য শুনতে চায়। এ ধরনের দাবীর ক্ষেত্রে সিএলসিএসের ২১ সদস্যের কমিটি থেকে সাত জনকে নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করার কথা। ওইদিন মিয়ানমারের বক্তব্য শোনার পর আর সাব-কমিটি গঠন করা হয়নি। জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের মহীসোপান সীমানার দাবী সম্বলিত প্রতিবেদন আকারে পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে মহীসোপানের দাবীতে আর কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না মিয়ানমার।

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন সনদ অনুযায়ী বাংলাদেশকে মহীসোপানের দাবী ২০১১ সালের মে মাসের মধ্যে সিএলসিএসে পেশ করতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, মিয়ানমারের মতো ভারতও তার মহীসোপান সংক্রান্ত দাবী পেশ করেছে। সিএলসিএসে ভারতের দাবী জমা পড়েছে এ বছরের ১১ মে’তে। বাংলাদেশ

ভারতের দাবীর ব্যাপারেও আপত্তি জানিয়েছে গত ২৯ অক্টোবর। স্বভাবতই বাংলাদেশ আশা করছে, ভারতের দাবীর ক্ষেত্রেও সিএলসিএস অনুরূপ সিদ্ধান্তই নেবে এবং সাব-কমিটি গঠন থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর বাংলাদেশের প্রধান কাজ হবে, মহীসোপান সংক্রান্ত তার দাবী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সিএলসিএসতে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা।

দ্বিতীয় খবরটি হলো, জাতিসংঘের আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত আইনী লড়াইয়ে মিয়ানমার তার আরবিট্রেটর নিযুক্ত করেছে একজন ভারতীয় নাগরিককে। তার নাম বিচারপতি চন্দ্র শেখর রাও। এর আগে ভারত তার আরবিট্রেটর নিযুক্ত করেছে সে দেশেরই খ্যাতিমান ভূতত্ত্ববিদ ড. পি শ্রীনিভাস রাওকে। বাংলাদেশের পক্ষে আরবিট্রেটরের দায়িত্ব পালন করবেন ব্রিটিশ আইনবিদ ডন লুই। এছাড়া আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে আইনী সহায়তা দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রাচীন আইনী প্রতিষ্ঠান ফোলি হগকে বাংলাদেশ নিয়োগ দিয়েছে। ভারত বা মিয়ানমার এখনও অনুরূপ কোনো আইনী প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়নি।

সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এবং উভয় দেশ বাংলাদেশের দাবীকৃত সমুদ্রসীমার বিশাল এলাকা নিজেদের বলে দাবী করে তাদের দাবীনামা জাতিসংঘে পেশ করার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশ গত ৮ অক্টোবর আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার নোটিশ দেয় এবং তার আরবিট্রেটরের নাম ঘোষণা করে। নিয়ম অনুযায়ী, এক মাসের মধ্যে ভারত ও মিয়ানমারের আরবিট্রেটরের নাম ও নিয়োগের কথা জানানোর বাধ্যবাধকতা ছিল। সে মতে, তারাও আরবিট্রেটর নিয়োগ করেছে। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে আইনী মীমাংসার প্রক্রিয়া শুরু করতে আর কোনো বাধা থাকলো না।

সমুদ্রসীমা নিয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরোধ দীর্ঘদিনের। এ ব্যাপারে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা কোনো ফয়সালা এনে দিতে পারেনি। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে আলোচনা হয়েছে কয়েক দফা। এরপর ২২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই। গত বছর ফের আলোচনা শুরু হয় এবং তিন দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দু'পক্ষের মধ্যে। এই তিনদফা আলোচনাও পূর্ববর্তী আলোচনার মতোই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। একইভাবে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। এরপর চলে গেছে ২৬ বছর। আর কোনো বৈঠক হয়নি। এরপর গত বছর এক দফা ও এ বছর এক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলাফল অভিন্ন, হতাশাজনক।

এই পটপ্রেক্ষায় বাংলাদেশকে আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে না গিয়ে উপায় ছিল না। নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা ও সুবিচার পাওয়ার এটাই ছিল সর্বশেষ সুযোগ। এ সুযোগও যে কোনো মুহূর্তে হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারতো। মিয়ানমার কিংবা ভারত যে কেউ আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে আগেই আপত্তি জানিয়ে দিলে এই পথও রুদ্ধ হয়ে যেতো। যেমন ভারত আগেই সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ও আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আগের একটি লেখায় অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব কমডোর (অব.) খুরশিদ আলমের একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছিলাম। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তা উদ্ধৃত করছি। তার ভাষায় : আনক্লজ অনুযায়ী সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তির মূলত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হলো, সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল, আন্তর্জাতিক আদালত এবং আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল। ভারত আগে থেকেই প্রথম দুটির ব্যাপারে আপত্তি দিয়ে রেখেছিল। অর্থাৎ এই দুই পদ্ধতি অবলম্বন করে কোনো দেশের পক্ষেই ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল না। বাকী একটি পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশ আনক্লজ অনুযায়ী সমুদ্র সীমার বিরোধ নিষ্পত্তির সুরাহা চেয়েছে।

মিয়ানার ও ভারতের দাবী সম্পর্কে তিনি জানান : বঙ্গোপসাগরে ভারত ও মিয়ানমারের দাবীর পর বাংলাদেশের জন্য প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের ২৮টি ব্লকের মধ্যে ১০টি ভারত ও ১৭টিতে মিয়ানমার আপত্তি দিয়ে রেখেছিল। তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সম্প্রতি তিনটি ব্লক (৫, ১০ ও ১১) বাংলাদেশ বিদেশী কোম্পানীর কাছে বরাদ্দ দেয়ার উদ্যোগ নিলে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আপত্তি আসে। ভারত ও মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আরবিট্রেশনে যাওয়ার মতো একটি বড় মাপের সাহসী সিদ্ধান্ত খুবই প্রয়োজন ছিল।

এই সাহসী ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তটি কিন্তু নিতে হয় খুবই সংগোপনে। দুই প্রতিবেশীর যে কেউ বিষয়টি

জানতে পারলে এবং চটজলদি আপত্তি জানিয়ে ফেললে বাংলাদেশ আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে যেতে পারতো না। সেক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাকেই একমাত্র ভরসা করতে হতো। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তাতে ফলাফল কি হতো তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। মিয়ানমার ও ভারত সম্ভবত ধারণা করতে পারেনি যে, বাংলাদেশ আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালে যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এ কারণেই বাংলাদেশ শেষ সুযোগটি কাজে লাগানোর উদ্যোগ-পদক্ষেপ নিতে পেরেছে।

সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমার ও ভারতের যে বিরোধ সেটা মূলত কোন পদ্ধতিতে সীমা নির্ধারিত হবে তা নির্ধারণের বিরোধ। এ ক্ষেত্রে দুটি স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো, ইকইটি পদ্ধতি এবং অপরটি হলো, ইকোডিসট্যান্স পদ্ধতি। বাংলাদেশ ইকুইটি পদ্ধতির পক্ষে। আর মিয়ানমার ও ভারত ইকোডিসট্যান্সের পক্ষে। বাংলাদেশ ইক্যুইটি পদ্ধতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে সমুদ্রসীমা টানতে চায়। কিন্তু মিয়ানমার ও ভারত ইকোডিসট্যান্স পদ্ধতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ও পশ্চিম থেকে পূর্বে সীমারেখা টানতে চায়। তাদের পদ্ধতি মানলে বাংলাদেশের ৪৮ হাজার ২৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা মিয়ানমার এবং ৩১ হাজার ৭৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ভারতের দখলে চলে যাবে। বাংলাদেশ কোনভাবেই এটা মেনে নিতে পারে না। মানলে বাংলাদেশকে এই বিশাল এলাকাই হারাতে হবে না, তার বহিঃসমুদ্রে যাওয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে।

সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে মিয়ানমার ও ভারতের অবস্থান অভিন্ন বিন্দুতে। অন্যভাবে বলা যায়, দু'দেশই বাংলাদেশের দাবীকৃত সমুদ্রসীমা নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়ার প্রশ্নে এক। মিয়ানমারের পক্ষ থেকে একজন ভারতীয় নাগরিককে আরবিট্রেটর নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রেও এই প্রশ্নটি আলোচনায় উঠে এসেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে এটা হয়তো কিছুই নয়। যে কোন দেশের নাগরিককে আরবিট্রেটর নিয়োগ করার স্বাধীনতা ও অধিকার মিয়ানমারের রয়েছে। বাংলাদেশ যেমন একজন ব্রিটিশ নাগরিককে আরবিট্রেটর নিয়োগ করেছে তেমনি মিয়ানমারও ভারতীয় নাগরিককে আরবিট্রেটর নিয়োগ করতে পারে এবং করেছে। এতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যখন দেখা যায়, মিয়ানমার ও ভারতের কমন প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ তখন একই দেশের দু'জন আরবিট্রেটর হলে ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশের বিপক্ষে তাদের অভিন্ন অবস্থান গ্রহণের একটা আশংকা সৃষ্টি হয়। অবশ্য ট্রাইব্যুনাল যদি দুটি বা আলাদা হয়, তবে তেমন আশংকা থাকবে না। এ সংক্রান্ত এক খবর থেকে মনে হয়েছে, ট্রাইব্যুনাল একটাই হবে। তিন দেশের তিন আরবিট্রেটর ছাড়া জাতিসংঘ আরও দু'জন আরবিট্রেটর নিয়োগ দেবে। এই পাঁচ আরবিট্রেটরই বিরোধের ফয়সালা করবেন। যদি তাই হয়, তবে ওই আশংকা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। এ কথা সত্য, তিন দেশের নিযুক্ত আরবিট্রেটররা তাদের স্ব স্ব মক্কেলের পক্ষে নথি, তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করবেন। কিন্তু যেহেতু মিয়ানমার ও ভারতের নীতি-লক্ষ্য অভিন্ন সে ক্ষেত্রে দু'দেশ নিজেদের মধ্যে তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি বিনিময়ের সুযোগ নিতে পারে। দুই আরবিট্রেটর পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে নিতে পারেন, অভিন্ন অবস্থান নিতে পারেন, দিতে পারেন অভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি।

বাংলাদেশের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, মিয়ানমার তার সমুদ্রসীমা নির্ধারণ বিষয়ে শুরু থেকেই ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেয়ে আসছে। মহীসোপান নিয়ে সিএলসিএসে মিয়ানমার যে দাবী পেশ করে, জানা গেছে, তার কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ভারতীয় নাগরিক সিএলসিএসের সাবেক সদস্য এনকে ঠাকুর। দ্বিতীয়ত, বঙ্গোপসাগরে ব্যাথিমেটিক ও জিওফিজিক্যাল জরিপ চালাতে মিয়ানমার ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর এন্টার্টিক এন্ড ওশেন রিসার্চের সহায়তা নেয়। তৃতীয়ত, সাইসমিক জরিপের উপাত্ত বিশ্লেষণেও মিয়ানমার ভারতের জিওফিজিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সহায়তা গ্রহণ করে।

মিয়ানমার ও ভারতের অভিন্ন নীতি-লক্ষ্য-অবস্থান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার এই সখ্যের কথাটি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশকে আরও সতর্ক হতে হবে। প্রতিপক্ষ যেই হোক বা যারাই হোক তার বা তাদের দুর্বল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা এখনও আমাদের মহীসোপানের সীমানা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারিনি। তৈরি করতে পারিনি সমুদ্রসীমার মানচিত্র। এছাড়া অন্যান্য তথ্য-উপাত্তও কতটা সংগৃহীত হয়েছে কে জানে! সাইসমিক জরিপ, যা এক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন, এখনও হয়নি। কেবলমাত্র কিছু অর্থ এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কাজগুলো দ্রুত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের আগেই আইনী লড়াইয়ের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।

ইতোপূর্বে আমরা বলেছিলাম, অবিলম্বে দুটি কমিটি গঠন করা দরকার– একটি টেকনিক্যাল কমিটি এবং অপরটি আইন সংক্রান্ত কমিটি। ভূতত্ত্ববিদদের নিয়ে টেকনিক্যাল কমিটি এবং সমুদ্র আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আইন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করতে হবে। এ দুটি কমিটি আরবিট্রেটর ও আইনী সহায়ক প্রতিষ্ঠান ফোলি-হগকে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত এবং আইন সংক্রান্ত ধারা ও নজির সরবরাহ করে সহায়তা করবে। আমরা আশা করবো, জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সরকার এদিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে এবং প্রয়োজনীয় কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নেবে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের তাৎপর্য

মেজর মুহাঃ হানিফ (অবঃ)

২১ নভেম্বর আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের এ দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর বাঙালী সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য একতাবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত আক্রমণ রচনা করে। এ দিন থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। ২১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যুদয় হলেও পৃথক পৃথকভাবে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর বাঙালী ইউনিটগুলো ২৬ মার্চ হতেই পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সেনানিবাস, নৌ ও বিমানঘাঁটিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মাতৃভাষার স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য শত্রুর নৃশংস কালো থাবা থেকে দেশের আপামর জনসাধারণের সম্ভ্রম রক্ষায় অমিততেজ ও বজ্র কঠিন সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুশমনদের উপর। জাতীয় পর্যায়ের কোনরূপ দিক নির্দেশনা ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পরিকল্পিত ও সুসংঘটিতভাবে ৯ মাস যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। পাকবাহিনী কর্তৃক ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল পাকবাহিনীর বিপুল গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে আমাদের মাতৃভূমির প্রতিটি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছিল। বিচ্ছিন্ন ও অসংঘটিত মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করা হয়ে পড়েছিল সুকঠিন। এমনই এক অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধরত আমাদের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর কমান্ডারগণ একটি সম্মিলিত ও পরিকল্পিত আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সে অনুযায়ী ২১ নভেম্বর সেনা, নৌ বিমানবাহিনী সমন্বয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল ঃ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হয় পাকবাহিনীর উপর। শুরু হয় অমিততেজ সশস্ত্র বাহিনীর প্রচণ্ড প্রতি আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রচণ্ডতায় তাৎক্ষণিকভাবে শত্রুমুক্ত হয় জকিগঞ্জ, তবলছড়ি, বেলুনিয়া, আটগ্রাম প্রভৃতি এলাকা। জলস্থল ও আকাশে প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে শত্রুর প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সকল সেক্টরে ব্যাপকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটতে থাকে নরঘাতক পাকবাহিনী। ওদের ধারালো নৃশংস নখগুলো থাবার মধ্যে গুঁটিয়ে নিতে ওরা বাধ্য হয়। ওদের চিন্তা-চেতনায় অসম্ভব এই আক্রমণে ওরা বিহ্বল হয়ে পড়ে। ওদের মনোবল নিম্নতম পর্যায়ে নেমে যায়। ২১ নভেম্বর সম্মিলিত আক্রমণের তীব্রতায় শত্রুবাহিনী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। হারিয়ে ফেলে তারা সবরকম মানসিক শক্তি। ফলে এর ২৪ দিনের মাথায় তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই সম্মিলিত আক্রমণ রচনার জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর ইউনিটগুলোকে সুসংঘটিত করা হয়েছিল। ব্রিগেড ফোর্স সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে ৩টি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ

ক. 'জেড' ফোর্স ঃ মেজর (পরবর্তীতে লেঃ জেনারেল) জিয়াউর রহমান এই ব্রিগেডের কমান্ডার নিযুক্ত হন। তার নামানুসারে এর নাম জেড ফোর্স রাখা হয়। ১, ৩ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে ময়মনসিংহের বিপরীতে তুরা পাহাড়ের পাদদেশে এই ব্রিগেড গঠন করা হয়।

খ. 'কে' ফোর্স ঃ লেঃ কর্নেল (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে ৪, ৯ ও ১০ ই বেঙ্গলকে নিয়ে আগরতলায় এই ব্রিগেড গঠন করা হয়। লেঃ কর্নেল খালেদ মোশারফের নামানুসারে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়।

গ. 'এস' ফোর্স ঃ সিলেটের বিপরীতে হেজামারা নামকস্থানে ২ ও ১১ ই বেঙ্গলকে নিয়ে এই ব্রিগেড গঠন করা হয়। এই ব্রিগেডের কমান্ডার লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) শফিউল্লার নামানুসারে এই ব্রিগেডের নাম এস ফোর্স রাখা হয়। সেক্টরসমূহ উরোক্ত ব্রিগেড ফোর্স পাক সেনাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বত্র একইযোগে কার্যকরী অপারেশনের নিমিত্তে রণকৌশল হিসেবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকাকে মোট ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। নৌ কমান্ডো গঠন সমুদ্র পথে পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তানে জাহাজে প্রেরিত অস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করার জন্য বাঙালী নৌ সেনাদের নিয়ে নৌ কমান্ডো গঠন করা হয়। এই নৌ কমান্ডোদের আক্রমণে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরসহ অন্যান্য নদী বন্দরগুলো পাক বাহিনীর জন্য ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নৌ কমন্ডো কর্তৃক অনেকগুলো পাক জাহাজ ধ্বংস করার ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তনে সর্বপ্রকার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং মূলত ঃ পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বিমানবাহিনী গঠন

স্থল ও নৌ যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য বিমানবাহিনীর প্রয়োজনীয় ছিল অনস্বীকার্য। এ উদ্দেশ্যে নাগাল্যান্ডের গভীর জঙ্গলে ডিমাপুর নামকস্থানে পরিত্যক্ত রানওয়েতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে ২৮ জন বাঙ্গালী বিমান সেনাকে সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেনা ও নৌ বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে এ বাহিনী পাক সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে।

উপসংহার

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ গভীর রাতে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই বাঙালী জাতীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয় একটি সশস্ত্র যুদ্ধ। এদিন এমনকি ১ ঘণ্টা পূর্বেও কোন বাঙালী সেনা, নৌ ও বিমান সদস্য জানতো না যে তাদের একটা সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। তারা জানতো না যে পাক বাহিনী অতর্কিতভাবে তাদের উপর গণহত্যা শুরু করবে। একটা জাতি যখন সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত হতে চলেছে তখন দেশপ্রেমিক সামরিক সদস্যদের প্রস্তুতি তো দূরের কথা কোনরূপ ইঙ্গিতও দেয়া হয়নি। জাতীয় বা রাজনৈতিকভাবে বাঙালী সামরিক সদস্যদের করণীয় সম্পর্কে কোনরূপ দিক নির্দেশনা ছিল না। ছিল না কোনরূপ যুদ্ধ পরিকল্পনা বা রণ কৌশল। সম্পূর্ণভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত এবং জাতীয় দিক নির্দেশনা ব্যতীরেকে বাঙালী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় প্রচেষ্টা ও উপস্থিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অগ্রসর হয় এবং বিজয় ছিনিয়ে আনে। কোন দেশের সামরিক সদস্যদের সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত রেখে একটা স্বাধীনতা যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করার এমন ইতিহাস আর কোথাও নেই। ইতিহাসে এটাও বিরল যে, এত অল্প সময়ে বিচ্ছিন্ন সামরিক সদস্যদের একতাবদ্ধ করে পরিকল্পিতভাবে যৌথ আক্রমণ রচনা করে জয়লাভ করা। প্রকৃত পক্ষে এই বিজয়ের বীজ রোপিত হয় ২১ শে নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ২১ শে নভেম্বর দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যে সার্বিক যুদ্ধের সূচনা করে তারই ফলশ্রুতিতে ১৬ই ডিসেম্বর শত্রুর বিশাল বাহিনী আত্মসর্পণ করতে বাধ্য হয়। ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় ও পাক বাহিনীর গ্লানিকর পরাজয়ের পিছনে ২১ শে নভেম্বরের সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সম্মিলিত আক্রমণ ছিল প্রধান কারণ। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ দিনটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। ২১ শে নভেম্বর নিছক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে পালনের দিন নয়। এটা একটি শপথ গ্রহণের দিন, এটা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জানার দিন। এ দিন আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, জাতীয় বিপর্যয়ে কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ও দিক নির্দেশনা ব্যতিরেকেই কিভাবে সুসংঘটিত হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হয়। ২১ শে নভেম্বর আমাদেকে শিখিয়েছে যে, অন্যায়ের নিকট মাথা নত না করে সংগ্রামী চেতনা ও দুর্জয় আক্রোশে কিভাবে অমিততেজ ও সাহস নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। ১৯৭১ সালের ২১ শে নভেম্বরের মতই ভবিষ্যতে জাতীয় যে কোন সংকটকালে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তাদের দেশপ্রেম, প্রশিক্ষণ ও আত্মোৎসর্গের বলে বলিয়ান হয়ে দেশের আপামর জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবে। প্রতি বছর ২১ শে নভেম্বর বাংরাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এই শপথই গ্রহণ

করে থাকে।